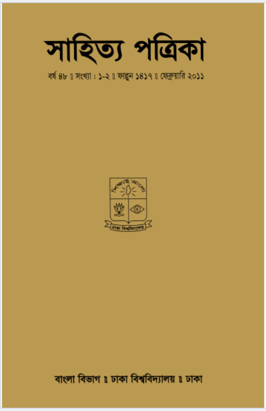

Vol. 48 | No. 1-2 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অভিধান চর্চা

Volume	48
Issue	1-2
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	স্বরোচিষ সরকার
Published online	February 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v48i1-2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i1-2.1
Pages	০৯-২০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অভিধান চর্চা

Check for updates

স্বরোচিষ সরকার*

১. ভূমিকা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে (১৮৮৫-১৯৬৯) 'প্রাচ্যবিদ্যা-কল্পদ্রুম' নামে অভিহিত করেছিলেন তাঁর সমকালের অন্য এক খ্যাতিমান পণ্ডিত মুহম্মদ এনামুল হক।[১] কল্পদ্রুম হলো স্বর্গের একটি বৃক্ষ, যার কাছে প্রার্থনা করা মাত্র সবকিছু পাওয়া যায়। এই অর্থ কাজে লাগিয়ে সংস্কৃত ভাষার একাধিক অভিধানের নামের শেষাংশে 'কল্পদ্রুম' শব্দটি যোগ করা হয়, যেমন—তেরো শতকে বোপদেবের 'কবিকল্পদ্রুম' অথবা উনিশ শতকের রাধাকান্ত দেব প্রণীত এবং বাংলা বর্ণমালায় মুদ্রিত আট খণ্ডের 'শব্দকল্পদ্রুম'।[২] 'শব্দকল্পদ্রুম' শব্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' নামেও একটি কোষগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন।[৩] তাই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে 'প্রাচ্যবিদ্যা-কল্পদ্রুম' বলার অর্থ তাঁকে অসাধারণ পণ্ডিত তথা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সর্বজ্ঞ বিবেচনা করা। কিন্তু একই সাথে লক্ষণীয়, 'কল্পদ্রুম' শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ফলে তিনি প্রতিতুলিত হন একটি অভিধানের সঙ্গে। অভিধানের সঙ্গে প্রতিতুলিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ বাস্তব জীবনে অভিধান চর্চার সঙ্গে নিজেকে কতটা সংশ্লিষ্ট করেছিলেন, নিশ্চয়ই তা অনুসন্ধানের দাবি করতে পারে।

যতটা জানা যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ মোট তিনটি অভিধানের প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এগুলোর মধ্যে একটি ১৯৬৫ সালে বাংলা একাডেমী থেকে তাঁর সম্পাদনায় *পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* নামে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই অভিধানের ২য় সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯৭৩ সালে দুই খণ্ডে এবং ৩য় সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯৯৩ সালে অভিন্ন খণ্ডে। অন্য দুটি অভিধানের একটির নাম বাংলা একাডেমীর *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* এবং অন্যটি করাচীস্থ কেন্দ্রীয় উর্দু উন্নয়ন বোর্ডের *উর্দু-অভিধান*।

১৯৬১ সালের জুলাই মাস থেকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সংকলন ও সম্পাদনার নীতিমালা তৈরি করেছিলেন।[৪] কিন্তু ১৯৭৪ সালে যখন এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়, তখন সে অভিধানের কোথাও তাঁর প্রাসঙ্গিক অবদানের কথা উল্লিখিত হয় নি। কেন্দ্রীয় উর্দু উন্নয়ন বোর্ডের *উর্দু-অভিধানের* ক্ষেত্রেও ব্যবহারিক অভিধানের মতো হয়েছিল বলে মনে হয়। অন্তত তাঁর জীবনীগ্রন্থ থেকে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, যাতে মনে হতে পারে যে, এই অভিধানের সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম মুদ্রিত হয়েছিল।[৫] অথচ এই অভিধানের জন্যও তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন। বিশেষভাবে ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৬০

* সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তিনি এই অভিধানের আলিফ ও বে অংশের মধ্যকার প্রায় দেড় হাজার শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে দিয়েছিলেন।[৬]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বিখ্যাত একটি প্রবন্ধের নাম : "বাঙ্গালা অভিধানে আমোদ"।[৭] শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনায় আনন্দ—এমন ধারণা প্রবন্ধটি পাঠ করার পর তৈরি হয়। ব্যুৎপত্তি নিঃসন্দেহে অভিধান সম্পাদনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু অভিধান সম্পাদনার ক্লান্তিকর দিকগুলোও রয়েছে, যেমন—বানান ঠিক করা, প্রয়োগবাক্য দেখে অর্থ নির্ণয় করা, ব্যাকরণগত তথ্যাদি পরিবেশন করা, সর্বোপরি নির্ভুল করার লক্ষ্যে প্রতিবার প্রুফ দেখার সময়ে পরিমার্জনার কাজ করা।[৮] এসব করতে গিয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঠিক কতটা এবং কী পরিমাণ আনন্দ উপভোগ করেছিলেন, তা জানার কোনো উপায় নেই। প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে একাধিক অভিধান সম্পাদনার কাজে তাঁর অংশগ্রহণের প্রকৃতি সম্পর্কে শুধু অনুমান করা যায়, চূড়ান্তভাবে কিছু বলা যায় না।

২. বাংলা একাডেমীর আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রকল্প

*আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*টি বাংলা একাডেমীর 'পূর্ব পাকিস্তানী বাংলার আদর্শ অভিধান' প্রকল্পের অংশ। ১৯৫৮ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পে প্রস্তাব করা হয় যে, অভিধানটি মোট তিন খণ্ডে সমাপ্ত হবে। প্রথম খণ্ডের নাম হবে 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান', দ্বিতীয় খণ্ডের নাম হবে 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' এবং তৃতীয় খণ্ডের নাম হবে 'বাংলা সাহিত্যকোষ'।

*আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে*র জন্য শব্দ সংগ্রহ শুরু হয় ১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে তা শেষ হয়।[৯] এই কালপর্বের অধিকাংশ সময় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রাজশাহী এবং করাচীতে অবস্থান করছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক পদ থেকে তিনি অবসর নিয়েছিলেন ১৯৫৮ সালের শেষ দিকে এবং ১৯৫৯ সালের ১৬ এপ্রিল থেকে ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি করাচীর কেন্দ্রীয় উর্দু উন্নয়ন বোর্ডে কর্তব্যরত ছিলেন।[১০] ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যখন বাংলা একাডেমীতে যোগ দেন তখন শব্দসংগ্রহের কাজ প্রায় শেষ দিকে। কাজটি ডিসেম্বর পর্যন্ত চললেও ততদিনে শব্দসংগ্রহের সিংহভাগ কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে*র জন্য যে ৪৫৩ জন সংগ্রাহক ৭৫১ কিস্তিতে মোট ১,৬৬,২৪৬টি শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন, সম্পাদক হিসেবে তাঁদের কোনো দিক-নির্দেশনা দানের সুযোগ বা প্রাসঙ্গিক কাজের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে কোনো রকম প্রশিক্ষণ দানের সুযোগ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পাননি। এভাবে সম্পাদকের নিয়ন্ত্রণের বাইরেই অভিধানটির যাবতীয় শব্দ সংগৃহীত হয়ে যায়।

অতঃপর সংগৃহীত শব্দের উপর ভিত্তি করে অভিধানটির ভুক্তি সংকলন এবং ভুক্তি সম্পাদনার কাজ শুরু হয়। অভিধান সংকলনের প্রথম থেকে যুক্ত না থাকার কারণে অভিধানটি সম্পাদনার সময়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে, সেটাই স্বাভাবিক। বিশেষভাবে গৃহীত সংকলন পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর একমত হওয়া কঠিন ছিল। পরোক্ষভাবে সে কথা তিনি ব্যক্তও করেন। প্রসঙ্গত আঞ্চলিক ভাষার

অভিধানে তাঁর লেখা ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদ দেখা যেতে পারে। সেখানে তিনি আঞ্চলিক ইংরেজি ভাষার একটি অভিধানের নাম করেছেন। অভিধানটির নাম *দি ইংলিশ ডায়ালেক্ট ডিকশনারি*। এটি ১৮৯৮ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত মোট ৬ খণ্ডে প্রকাশিত। এই অভিধানের অতিরিক্ত একটি খণ্ডে উপভাষার ব্যাকরণও সংযুক্ত করা হয়েছিল। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে এর উপাত্ত সংগৃহীত হয়।[১১] এই ধরনের যাঁর মানসিক প্রস্তুতি, তার জন্য *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*-এর শব্দসংগ্রহ পদ্ধতি পীড়াদায়ক মনে না হয়ে পারে না।

শব্দসংগ্রহ পদ্ধতিতেও তিনি খুশি থাকতে পেরেছেন, এমন মনে হয় না। শব্দসংগ্রহের জন্য যে প্রোফর্মাটি তৈরি করা হয়েছিল, তা আটটি কলামে বিভক্ত ছিল: প্রথম কলামে ক্রমিক নং, দ্বিতীয় কলামে শব্দ, তৃতীয় কলামে শব্দের অর্থ, চতুর্থ কলামে অঞ্চল নির্দেশ, পঞ্চম কলামে প্রয়োগবাক্য, ষষ্ঠ কলামে উচ্চারণের বৈচিত্র্য, সপ্তম কলামে প্রয়োজন হলে ব্যুৎপত্তি, এবং অষ্টম কলামে মন্তব্য।[১২] বিশেষ লক্ষণীয়, এই প্রোফর্মাটি ছিল ইংরেজি ভাষায়।[১৩] ইংরেজি ভাষার একটি প্রোফর্মা বাংলা উপভাষার তথ্য-সংগ্রহকারীকে বিভ্রান্ত করবে, সেটাই স্বাভাবিক। প্রথম বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে, প্রোফর্মাটি তিনি রোমান লিপিতে পূরণ করবেন, না বাংলা লিপিতে পূরণ করবেন, তা নিয়ে।

শব্দসংগ্রহের জন্য তৈরি প্রোফর্মার ক্রমটিও যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অপছন্দের ছিল, ১৯৬১ সালে *ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের* জন্য তিনি শব্দসংগ্রহের যে নীতিমালা করেছিলেন, তার সঙ্গে তুলনা করলে তা বোঝা যায়। যেমন ব্যবহারিক অভিধানের নীতিমালায় শহীদুল্লাহ্‌ প্রথমে শব্দ চয়ন না করে প্রথমে বাক্য চয়ন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[১৪] তারপর সেই বাক্যের মধ্যকার শব্দ কী অর্থ বহন করে তা ঠিক করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে প্রথমে শব্দ চয়ন এবং তারপরে সেই শব্দ দিয়ে উদাহরণ-বাক্য তৈরি করতে বলা হয়।

অভিধানটির প্রসঙ্গকথা থেকে জানা যায়, *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের* জন্য যাঁরা শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অর্ধেক ছিলেন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এক-চতুর্থাংশ ছিলেন ছাত্র, এবং এক-চতুর্থাংশ ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী।[১৫] আঞ্চলিক ভাষার শব্দ সংগ্রহ করার জন্য প্রথমে ব্যক্তিপর্যায়ে এবং পরে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে এঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। অর্থাৎ কোনো রকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই ৪৫৩ জন সংগ্রাহক এই বিশাল কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। শব্দসংগ্রাহক নির্বাচনের এই প্রক্রিয়াটিও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র আদর্শের সঙ্গে মেলে না। কারণ *ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের* শব্দ সংকলনের জন্য তিনি যাঁদের নির্বাচন করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান ভাষাবিদ, লেখক এবং শিক্ষক। আঞ্চলিক অভিধানের মতো একটি ভাষাতাত্ত্বিক কাজে অদীক্ষিত লোকদের সংগ্রাহকের দায়িত্ব দেওয়ায়, সংগৃহীত শব্দ থেকে ভুক্তি রচনার কাজ দুরূহ হবে, সেটাই স্বাভাবিক। প্রসঙ্গকথায় বাংলা একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানও তা স্বীকার করেন এবং জানান, ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ভুক্তি রচনার কাজ শুরু হওয়ার পর মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, কাজী দীন মুহম্মদ প্রমুখ পণ্ডিতকে এজন্য প্রচুর

পরিশ্রম করতে হয়েছিল।[১৬] এমনকি শব্দগুলো আসলেই প্রাসঙ্গিক জেলার কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে বিভিন্ন জেলার লোককে ডেকে অন্তত সতেরোটি সভার আয়োজন করতে হয়। অথচ শব্দ সংগ্রহের পূর্বেই যদি এ জাতীয় সভার আয়োজন করা সম্ভব হতো, তাহলে আরো কম সময়ে আরো বেশি প্রতিনিধিত্বশীলভাবে অভিধানটির সম্পাদনার কাজ শহীদুল্লাহ্‌ সম্পন্ন করতে পারতেন।

প্রোফর্মার একটি কলামে বলা হয়েছে, সম্ভব হলে শব্দটির ব্যুৎপত্তি প্রদান করতে হবে। এটিও একটি বিভ্রান্তিকর প্রসঙ্গ। যেখানে একজন ভাষাতাত্ত্বিক একটি শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে হিমশিম খান, সেখানে একজন সাধারণ শব্দসংগ্রাহক কিভাবে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে দেবেন, তা বোঝা কঠিন। তাই অনুমান করি, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি থাকাটাও শহীদুল্লাহ্‌র জন্য বাড়তি কিছু ঝামেলা সৃষ্টি করে।

এভাবে সংকলিত একটি অভিধানের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করা কত কঠিন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন।

৩. আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে শহীদুল্লাহ্‌র অবদান

সম্পাদনার দায়িত্ব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ঠিক কতটা পালন করেছিলেন, সে প্রশ্নও তোলা যায়। *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের* প্রারম্ভিক অংশ পাঠ করলে দেখা যায়, বাংলা একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের লেখা প্রসঙ্গকথা যতটা সম্পাদকীয় হয়ে উঠেছে, প্রধান সম্পাদক হিসেবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র লেখা ভূমিকাটি ততটা সম্পাদকীয় হয়ে ওঠেনি।[১৭]

সৈয়দ আলী আহসান তাঁর প্রসঙ্গকথার প্রথম অনুচ্ছেদেই আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেন। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সৃষ্টিতে স্বাতন্ত্র্য আনা এবং বিশেষ ভাষারীতি তৈরিতে এই ধরনের অভিধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে তিনি তাঁর বিশ্বাসের কথা জানাতে ভোলেন না। এর পর তিনি একে একে ব্যক্ত করেন : প্রাসঙ্গিক অভিধান প্রণয়নের পরিকল্পনার কথা, কিভাবে শব্দ সংগ্রহ করা হয় এবং কারা কারা এর সঙ্গে যুক্ত হন তাদের বিবরণ ও পরিচয়, সংগৃহীত শব্দগুলোকে কিভাবে যাচাই করা হয় এবং কে কে সেই যাচাই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, শব্দ সংগ্রহে কত ধরনের ভুল হয়েছিল এবং তা থেকে কিভাবে মুক্তি ঘটানোর চেষ্টা করা হয়, ভুক্তি রচনা এবং সম্পাদনার কাজে কার কার পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, যেসব অঞ্চলের শব্দ সংগ্রহ করা হয়েছে সেসব অঞ্চলের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য কেমন, অভিধানে গৃহীত বর্ণানুক্রম, অভিধানের বানান, অভিধানে ব্যবহৃত বিভিন্ন সংকেতের অর্থ, শব্দার্থবিষয়ক টীকা এবং প্রকাশনা ও মুদ্রণসংক্রান্ত তথ্যাদি।

অন্যদিকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ভূমিকার আড়াই পৃষ্ঠাব্যাপী প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের ইতিহাস ও বাংলা ভাষার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা থাকলেও আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে কোনো কথা নেই। সাড়ে চার পৃষ্ঠাব্যাপী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণভাবে জি এ

গ্রিয়ারসন সাহেবের *দি লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া* গ্রন্থের আলোচনা। গ্রিয়ারসন সাহেবকে তিনি সমালোচনা করেন এই বলে যে, তাঁর সংগ্রাহকদের অধিকাংশই ধ্বনিবিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন এবং একই কারণে তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত হয়নি, আবার পাশাপাশি এ কথাও স্বীকার করেন যে, গ্রন্থটি প্রাসঙ্গিক উপভাষা সম্পর্কে জানার জন্য প্রধান অবলম্বন। এই পরিচ্ছেদে তিনি গ্রিয়ারসন সাহেবের গ্রন্থ থেকে উদাহরণ তুলে ধরে দেখান, একই বাক্য অঞ্চলভেদে কী কী ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সেই আলোচনাই বিস্তৃতি পায়। শব্দভাণ্ডারের দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের উপভাষা কতটা বৈচিত্র্য ধারণ করে, এই পরিচ্ছেদে তিনি তা উদাহরণ সহযোগে দেখান। কিন্তু উদাহরণগুলি তিনি এই অভিধান থেকে নেন নি, নিয়েছেন গ্রিয়ারসনের গ্রন্থ থেকে। এটা বোঝা যায়, উদাহরণের প্রথম শব্দটি দেখে। উদাহরণের প্রথম শব্দ 'আইয়ে'। কুমিল্লা, বরিশাল, বগুড়া, এবং রংপুরে শব্দটির ব্যবহার রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। অথচ আঞ্চলিক অভিধানের প্রথম খণ্ডের ২১ পৃষ্ঠায় 'আইয়ে' ভুক্তিতে জানানো হয় শব্দটি শুধু ময়মনসিংহ এবং খুলনায় পাওয়া গেছে।[১৮] পঞ্চম পরিচ্ছেদটিও আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সম্পর্কে প্রায় মন্তব্যহীন। সেখানে বিভিন্ন ভাষার উপভাষার একাধিক অভিধানের তথ্য সরবরাহ করা হয় এবং ব্যাপকভাবে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলিত হোক এই আশা প্রকাশ করা হয়। লেখা হয় : "বাংলা ভাষা পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম বাঙ্গালা এবং বিহার, আসাম ও বর্মার কোনও কোনও অঞ্চলে প্রচলিত। এই সকল স্থানের উপভাষার নমুনা সংগৃহীত হইলে, বাংলা ভাষার উপভাষার একটি সার্থক পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইতে পারিত। তাহা কবে হইবে এবং কখনও হইবে কিনা, আমরা জানি না।"[১৯]

এমন অপরিকল্পিত একটি অভিধান সম্পাদনা করতে গিয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে কতটা কষ্ট করতে হয়, বিভিন্ন সূত্র থেকে সে সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়। এই কাজের জন্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতো পণ্ডিত ব্যক্তির দীর্ঘ পাঁচ বছর লাগার কথা নয়। অথচ পাঁচটি বছর তিনি এর জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করেছিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন তিনি সকাল দশটায় অফিসে আসতেন এবং বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করতেন। কোথাও যেতে হলে যথারীতি ছুটি নিয়ে যেতেন। সম্ভবত অভিধানের কাজে ব্যাঘাত হবে ভেবে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ এ সময়ে তাঁকে অন্য কোনো কাজে যুক্ত করেনি, যেমন তাঁর আগ্রহ এবং যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আলাওলের 'পদ্মাবতী' সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁকে প্রদান করা হয়নি। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কক্ষে টেলিফোন সুবিধাও দেওয়া হয়নি, সেটিও তাঁর কাজের ব্যাঘাত হবে ভেবে কিনা, বলা মুশকিল। তবে এর ফলে তাঁর কোনো কর্মঘণ্টা অপচিত হয়নি। এতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সবসময়ে স্বস্তি বোধ করেছেন, তা মনে হয় না। কাজের চাপে কখনো কখনো তাঁর মনে হয়েছে এর চেয়ে পাঁচশো টাকা বেতনের শিক্ষকতা অনেক ভালো।[২০]

সম্পাদিত অভিধানটির দিকে তাকিয়েও বোঝা যাবে এ ক্ষেত্রে তাঁর পরিশ্রমের মাত্রাটা কেমন ছিল। পঁচাত্তর হাজার দাবি করা হলেও অভিধানটির ভুক্তিসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশি হবে না।[২১] সৈয়দ আলী আহসানের প্রসঙ্গকথা থেকে জানা যায়, তিন বছর ধরে

মোট ১,৬৬,২৪৬টি শব্দ সংগ্রহ করা হয়েছিল। অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশের বেশি শব্দ ভুক্তির মর্যাদা পায়নি। সেগুলো বাদ দিতে হয়, কারণ অনেক শব্দ প্রমিত ভাষার শব্দের অনুরূপ ছিল, অনেক শব্দের অর্থ লেখা ছিল না অথবা প্রয়োগবাক্যের সঙ্গে প্রদত্ত অর্থের সংগতি ছিল না, একই শব্দ একাধিক ব্যক্তি সংগ্রহ করেছিলেন, অনেক সংগ্রাহক নিজে থেকে শব্দ তৈরি করে পাঠিয়েছিলেন ইত্যাদি।[২২] এসব বিবেচনায় দেড় লক্ষ শব্দের মধ্য থেকে পঞ্চাশ হাজার শব্দকে বেছে বের করার কাজ শুধু কঠিন নয়, সুকঠিন। এ ব্যাপারে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সহযোগীগণ হয়ত তাঁকে সাহায্য করেছেন, তারপরেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যেহেতু তাঁকেই দিতে হয়েছিল, তাই প্রাসঙ্গিক শব্দ বাদ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁকে নিশ্চয়ই সব দিক বিবেচনা করে দেখতে হয়েছে।

ভৌগোলিক দিক দিয়ে ষাটের দশকের পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশ অভিন্ন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বিভাজন মেনে নিলে এখানকার অধিকাংশ শব্দরূপের অন্তত চার-পাঁচটি রূপান্তর লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে তাই পঞ্চাশ হাজার শব্দ প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। তাছাড়া যে ক্রিয়াপদ অঞ্চলভেদে সর্বাধিক বৈচিত্র্য ধারণ করে, শব্দসংগ্রহ পর্যায়ে সেগুলো গুরুত্ব না পাওয়ায়, অভিধানটির ভুক্তিসংখ্যা আরো কম হয়। অভিধানের প্রয়োগবাক্যগুলো দেখেও তা বোঝা যায়। যেমন এ অভিধানের প্রথম প্রয়োগবাক্য ('অ' শীর্ষক প্রথম ভুক্তির) : অ ব্যাডা হুনো হুনো। অভিধানের মধ্যে 'ব্যাডা' শীর্ষক ভুক্তি পাওয়া গেলেও অভিধানে 'হুনো' নামের কোনো ভুক্তি নেই। 'হোনা' নামে একটি ভুক্তি রয়েছে, তবে ৪টি অর্থান্তরই বিশেষ্য জাতীয়। অবশ্য 'হুনা' ভুক্তির একটি অর্থ ক্রিয়াবাচক, যেখানে অর্থ বলা হয়েছে 'শ্রবণ করা'। কিন্তু এই 'হুনা'-র কী কী রূপান্তর হতে পারে, ভুক্তিটি সে ব্যাপারে মন্তব্যহীন। অথবা ধরা যাক 'আরং' ভুক্তির একটি প্রয়োগবাক্য : 'আরং দ্যাখ্‌তাম্‌ যাইয়াম্‌।' অভিধানটিতে 'দ্যাখ্‌তাম্‌' বা 'যাইয়াম্‌' নামে কোনো ভুক্তি নেই। এমনকি 'দ্যাখা' অথবা 'জাওয়া/যাওয়া/জাই/যাই' নামেও কোনো ক্রিয়া-ভুক্তি নেই। প্রাসঙ্গিক ক্রিয়ার রূপান্তর তো দূরের কথা। এর ফলে পাঠক 'হুনো', 'দ্যাখতাম' বা 'যাইয়াম' সম্পর্কে কোনো রকম ধারণা এই অভিধান থেকে পান না।

*আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*টিতে শব্দের অর্থ নির্ণয়ের কাজ করেছিলেন সংশ্লিষ্ট সংগ্রাহকগণ। প্রসঙ্গত সৈয়দ আলী আহসান জানান, "সর্বত্র সংগ্রাহক প্রদত্ত অর্থই দেওয়া হইয়াছে। অর্থকে সুবোধ্য করিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়োগ ও টীকাটিপ্পনী ব্যবহার করা হইয়াছে।"[২৩] এই ধরনের মন্তব্য সম্পাদকের গুরুত্বকে লঘু করে। তাছাড়া এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ সংগ্রাহক প্রদত্ত অর্থকে 'সর্বত্র' বজায় রেখেছেন। সংগৃহীত প্রয়োগবাক্য যদি সংশ্লিষ্ট শব্দের অর্থকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে না পারে, শহীদুল্লাহ্‌ সেক্ষেত্রে সেইসব শব্দের অর্থ বদলে দেননি, তা বিশ্বাস করা কঠিন।

বর্তমান আলোচকের ধারণা, আঞ্চলিক অভিধান সম্পাদনায় প্রাসঙ্গিক শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ সবচেয়ে বেশি সময় দিয়েছিলেন। এর ফলে অভিধানের এই ব্যুৎপত্তি অংশ অন্যান্য অংশের তুলনায় অধিক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই অভিধানের যাঁরা প্রশংসা করেছেন, তাঁরাও এই ব্যুৎপত্তির কথা ভেবে প্রশংসা করেছেন। প্রোফর্মা অনুযায়ী শব্দসংগ্রাহকগণ তাঁদের সাধ্য অনুযায়ী ব্যুৎপত্তি হয়ত দিয়েছিলেন, সংগত কারণে সেগুলোর অধিকাংশ যথাযথ ছিল না। বাংলা ভাষার সঙ্গে যেসব ভাষার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, তার প্রায় সবগুলো ভাষা মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ জানতেন। তাই যে কোনো শব্দের উৎস সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল। তাছাড়া তাঁর সমকালে এ ধরনের কাজ করার মতো যোগ্যতা আর কারো ছিল বলে মনে হয় না। *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের* বহু রকম অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি যত্রযত্র চোখে পড়ে। কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত ত্রুটি বিরল। মনে হয়, আঞ্চলিক অভিধানের প্রাসঙ্গিক ব্যুৎপত্তি তৈরি করার কাজকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বেশ উপভোগ করেছিলেন। এই কাজ ছিলো প্রধানত দুই রকমের : শব্দসংগ্রাহকদের প্রদত্ত ব্যুৎপত্তি সংশোধন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি প্রদান। বাংলাদেশের আঞ্চলিক শব্দগুলোর উৎস যে কত বিচিত্র, এইসব ব্যুৎপত্তির দিকে তাকালে তা বোঝা যায়। অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটি সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান তাঁর প্রসঙ্গকথায় কোনো মন্তব্য করেননি।

৪. ব্যবহারিক অভিধান সম্পাদনা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যখন *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* সম্পাদনা করছিলেন, তারই এক পর্যায়ে তিনি বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধান প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* সম্পাদনার অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে তিনি কাজে লাগানোর সুযোগ পান। *আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের* যেসব ত্রুটি তিনি দেখেছিলেন, সেগুলো থেকে ব্যবহারিক অভিধানটিকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তাই অভিধানের শব্দসংগ্রহ পর্ব যাতে নিরঙ্কুশ হয়, সেজন্য ১৯৬১ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তিনি একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। এই নীতিমালার নাম দেওয়া হয় : 'পূর্ব পাকিস্তানী বাংলার আদর্শ অভিধান—২য় খণ্ডের সঙ্কলন ও সম্পাদনা পদ্ধতি'। অবশ্য নীতিমালা প্রণয়নের পূর্ব থেকে তিনি ব্যবহারিক অভিধান প্রণয়নের কাজ কিছুটা এগিয়ে রেখেছিলেন। বিশেষভাবে এগিয়ে রেখেছিলেন প্রাথমিক উপকরণ নির্বাচন এবং সহযোগী মনোনয়নের কাজ।

তিনি বিশ্বাস করতেন, শব্দের অভিধা বাক্যসাপেক্ষ, তাই অভিধান তৈরি করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন লিখিত সাহিত্য থেকে বাক্য চয়ন করা এবং চয়িত বাক্যের মধ্যকার শব্দ বিশ্লেষণ করার পর তার অর্থ নির্ণয় করা। এ লক্ষ্যে তিনি আহমদ শরীফ, অজিতকুমার গুহ এবং মুনীর চৌধুরীকে নিয়ে প্রথমে প্রাথমিক উপকরণ নির্বাচনের কাজ শুরু করেন। আহমদ শরীফ এবং তিনি নির্বাচন করেন মধ্যযুগের সাহিত্যকর্মাদি। ১৮০০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ের সাহিত্য নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয় অজিতকুমার গুহকে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সময়ের সাহিত্যিক নিদর্শনের নমুনা নির্বাচনের দায়িত্ব পান মুনীর চৌধুরী। সকলেই যথাসময়ে তাঁদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

নির্বাচিত এই সাহিত্য থেকে কিভাবে শব্দ সংগৃহীত হবে, সে ব্যাপারে ঐ বছরের ৬ জুলাই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত ছিল নিম্নরূপ :

(ক) একজন কোন একটা বিশেষ বই পাঠ করিয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট শব্দগুলি উদাহরণসহ চিহ্নিত করিবেন।
(খ) দ্বিতীয় ব্যক্তি শব্দগুলি উদাহরণসহ, কার্ডে, দ্বিতীয় লাইন বাদ দিয়া নকল করিবেন।
(গ) তৃতীয় ব্যক্তি কার্ডে শব্দের অর্থ লিখিবেন। শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরূপণের বেলায় কেবল মূলরূপ দেখাইলেই চলিবে—মধ্যবর্তী কোনরূপ দেখানোর প্রয়োজন নাই।[২৪]

শব্দসংগ্রহের কাজ যাতে এভাবে অগ্রসর হয়, সেজন্য মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক এবং এ কে এম হাবীবুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানে বেশ কয়েকজন সংকলক কাজ করতে শুরু করেন। এই সংকলকগণের মধ্যে ছিলেন আঃ রশিদ ওয়াসেকপুরী, আখ্‌তাবুর রহমান, আনিসুজ্জামান, আবূ তালিব, আবদুস সাত্তার, আলী আহমদ, ইদ্রিস মিয়া, কাজি আকরাম হুসেন, কাজী রফিকুল হক, গোলাম সামদানী কোরায়শী, জগলুল হায়দার চৌধুরী, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, তারাপদ ভট্টাচার্য, নিজামুদ্দীন, মীর আবুল হুসেন, মুফাখ্‌খারুল ইসলাম, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুহম্মদ জহুরুল হক, মুহম্মদ মাহফুযুল্লাহ্‌, মোল্লা এবাদত হোসেন, মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, রওশন আরা বেগম, লুৎফুল হায়দার চৌধুরী, সন্‌জীদা খাতুন প্রমুখ।

অভিধানটির প্রণয়ন প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ যে নীতিমালা তৈরি করেছিলেন, ২০০০ সালে প্রকাশিত *ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের* পরিমার্জিত সংস্করণের ভূমিকায় তা প্রথম বারের মতো মুদ্রিত হয়। তাতে দেখা যায়, ব্যবহারিক অভিধানটিকে তিনি কতটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংকলনের চেষ্টা করেছিলেন। এই নীতিমালা থেকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অভিধানচিন্তার সারাৎসারও খুঁজে পাওয়া যায়। সমকালের তুলনায় তিনি কতটা এগিয়ে ছিলেন, সেটাও এই নীতিমালা থেকে বোঝা যায়।

তিনি চেয়েছিলেন নির্বাচিত সাহিত্য থেকে কালানুক্রম অনুযায়ী শব্দ সংগ্রহ করতে। কারণ, তিনি জানতেন, কালের পরিবর্তনে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ অভিধানগুলো এই পদ্ধতিতে শব্দ সংগ্রহ করেছে, তাও তিনি জানতেন। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, অভিধানের মূল শব্দ, অর্থ ও আনুষঙ্গিক শব্দের বানানের ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক বানান ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রসঙ্গত তিনি আধুনিক বানানের পক্ষে যে মত দেন, ১৯৯২ সালের আগে পর্যন্ত বাংলা একাডেমী সে বানান ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়নি। যেমন প্রাসঙ্গিক নীতিমালায় তিনি লিখেছিলেন : "তৎসম শব্দে ব্যবহৃত ঈ-কার ও ঊ-কার রক্ষিত হবে। স্ত্রীবাচক শব্দ ব্যতীত তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দে সর্বত্র ই-কার ও উ-কার হবে।"[২৫]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র এই নীতিমালা অনুযায়ী শব্দ সংকলন ও ভুক্তি রচনার কাজ অগ্রসর হচ্ছিল বলে মনে হয়। ১৯৬৪ সালের ৪ জুন পর্যন্ত এভাবে সংগৃহীত শব্দের সংখ্যা

দাঁড়ায় ২১,৫৭৮। ব্যবহারিক অভিধানের সম্পাদক হিসেবে তিনি এসব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। সম্পাদনার কাজে সুবিধা হবে ভেবে ৪ জুন (১৯৬৪) অনুষ্ঠিত সভায় তিনি একজন সহকারী সম্পাদক নিয়োগের জন্য পরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ জানান। সেই নিয়োগ সম্ভবত হয়নি। তাই ১৯৬৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্যবহারিক অভিধানের অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে বিভিন্ন সহায়ক উৎস থেকে তথা প্রচলিত অভিধানগুলো থেকে শব্দ সংগ্রহের পরিমাণ এই সময়ের মধ্যে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়; একুশ হাজার থেকে সত্তর হাজারে। ইতোমধ্যে কাজী দীন মুহম্মদ বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। অভিধানের সম্পাদক হিসেবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র পরিবর্তে তাঁর নাম প্রস্তাব করা হয়। অভিধান প্রণয়নের নীতিমালাতেও পরিবর্তন আসে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যেখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিদেশি শব্দগুলোর উৎস বাংলা প্রতিবর্ণে নির্দেশ করলেই চলবে, কাজী দীন মুহম্মদ সেখানে সিদ্ধান্ত নেন (৩০ ডিসেম্বর ১৯৬৮), আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দের বেলায় আরবি লিপি ব্যবহার করতে হবে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যেখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যাবতীয় অতৎসম শব্দে হ্রস্ব ই ও হ্রস্ব উ ব্যবহৃত হবে, কাজী দীন মুহম্মদ সেখানে সিদ্ধান্ত নেন, মূল ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে সংগতি রেখে দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ ঊ ব্যবহৃত হবে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যেখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তৎসম শব্দের জন্য সংকেত স. এবং হিন্দুস্তানির জন্য 'হি.', কাজী দীন মুহম্মদ সেখানে সিদ্ধান্ত নেন সংস্কৃতের জন্য 'ত.' এবং হিন্দুস্তানির জন্য উর্দুর 'উ.'। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যেখানে ঙ এবং ং দুটোই রক্ষা করতে চেয়েছেন, কাজী দীন মুহম্মদ সেখানে শুধু ং রাখতে চান। সর্বোপরি, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর নীতিমালাটি প্রণয়ন করেছিলেন ভাষার চলিত রীতিতে, তাতে মনে হয়, ব্যবহারিক অভিধানের ভুক্তি রচনাও তিনি চলিত রীতিতে করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন, কিন্তু কাজী দীন মুহম্মদ তাঁর নীতিমালাটি সাধু রীতিতে প্রণয়ন করেন এবং সংগত কারণেই তাঁর নির্দেশে ব্যবহারিক অভিধানের ভুক্তিগুলোও সাধু রীতিতে রচিত হয়।[২৬]

কবীর চৌধুরী বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর কাজী দীন মুহম্মদের এই নীতিমালার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন এবং কাজী দীন মুহম্মদকে অভিধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। অতঃপর ১৯৬৯ সালের ১০ মে মুহম্মদ এনামুল হক এই অভিধানের সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। তাঁর সম্পাদনায় ১৯৭৪ সালে অভিধানটির স্বরবর্ণ অংশ প্রকাশ পায়। এই অংশের ভূমিকায় অভিধানের সংকলন প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে কটু কথা তিনি লিখেছেন, এই পটভূমি না জানা থাকলে, তা খানিকটা অহংকারী বলে মনে হতে পারে। তিনি লিখেছিলেন, "নানা আনাড়ী লোকের হাত ঘুরিয়া অভিধানটি যেই অবস্থায় আমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার বিশেষ উন্নতি সাধন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।"[২৭] বর্তমান আলোচকের ধারণা, অভিধানটির ভুক্তি রচনার ক্ষেত্রে সংকলকগণ যদি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রণীত নীতিমালার প্রতি আগাগোড়া অনুগত থাকতেন, তাহলে মুহম্মদ এনামুল হক এমন বিরক্ত হতেন না, অভিধানটিও ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠত।

৫. উপসংহার

যে অভিধানে তিনি অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রম করেছিলেন, যে অভিধানের পরিকল্পনার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না, এবং যে অভিধানের অধিকাংশ কাজ তাঁর আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়নি, সেই অভিধানের সম্পাদক হিসেবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নাম চিরস্থায়ী হয়ে গেছে। অথচ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ যে অভিধানের প্রাথমিক পরিকল্পনা করেছিলেন, উপাদান সংগ্রহের জন্য যাবতীয় কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিলেন, কারা কারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হবে তা ঠিক করেছিলেন, কিভাবে প্রাথমিক উপকরণ সংগৃহীত হবে তা নির্ধারণ করেছিলেন, এমনকি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী যে অভিধানের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল, ১৯৭৪ সালে স্বরবর্ণ অংশ প্রকাশের সময়ে, ১৯৮৪ সালে ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ প্রকাশের সময়ে অথবা ১৯৯২ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ নামে এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশের সময়ে তাঁর সেই অবদানের কথা কোথাও উল্লেখিত হয়নি। ২০০০ সালে পুরনো নথিপত্র ঘাঁটতে গিয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র প্রাসঙ্গিক অবদানের বিষয়টি বর্তমান আলোচকের চোখে পড়ে, তখন ব্যবহারিক অভিধানের পরিমার্জিত সংস্করণের ভূমিকায় তা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়।[২৮] উর্দু উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রকাশিত উর্দু অভিধানের বেলাতেও প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটা সম্ভব।

অভিধানের আদর্শ সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সুনির্দিষ্ট ধারণা ছিল। সেই ধারণা অনুযায়ী বাংলা অভিধান প্রণীত হোক, তা তিনি প্রত্যাশা করতেন। এমনকি বয়সের পরিবর্তনেও সে প্রত্যাশায় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তাই ১৯২০ সালে কলকাতার একটি ছাত্র সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি যে কথা ব্যক্ত করেছেন, আবার ১৯৬১ সালে একটি অভিধানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময়েও সেই একই ধারণার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। ১৯২০ সালের উক্ত সম্মিলনীতে তিনি বলেছিলেন : "আমাদের চাই *The New Oxford Dictionary*-র ন্যায় একটি ঐতিহাসিক প্রণালীক্রমে সজ্জিত অভিধান, ইহার জন্য সমস্ত প্রাচীন মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুথির শব্দসূচি করিতে হইবে।"[২৯] আসলে অভিধানটির প্রাথমিক নাম ছিল *এ নিউ ইংলিশ ডিকশনারি*, ১৮৯৫ সালে এর নাম পরিবর্তন করা হয় *দি অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি* বা সংক্ষেপে 'ওইডি' (OED) নামে। আঠারো লক্ষ প্রয়োগবাক্য সংবলিত এই অভিধানে প্রতিটি শব্দের সম্ভাব্য সব ধরনের পরিচয় অন্তর্ভুক্ত। বিশেষভাবে লক্ষণীয় শব্দের ঐতিহাসিক বিবর্তন। অর্থাৎ শব্দটির জন্ম কখন হয়েছিল, কে প্রথম তা ব্যবহার করেছিলেন, কিভাবে তার অর্থান্তর ঘটল, কতগুলো অর্থান্তর সৃষ্টি হলো তার বিবরণ এই অভিধানে রয়েছে। ব্যুৎপত্তি, উৎস-ভাষা নির্ধারণ, এবং ব্যাকরণ-নির্দেশ তো থাকছেই।[৩০] একজন ভাষাবিজ্ঞানীর নিকট এই ধরনের অভিধানই হতে পারে অনিঃশেষ 'আমোদ' বা আনন্দের খোরাক। শুধু ইংরেজি ভাষায় নয়, পৃথিবীর আরো অনেক ভাষায় এই জাতীয় অভিধান প্রণীত হয়েছে।[৩১] তাই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতো একজন পণ্ডিত সংগত কারণেই এমন প্রত্যাশা করতে পারেন যে, তাঁর মাতৃভাষাতেও এমন একটি অভিধান প্রণীত হোক। ব্যবহারিক অভিধানের পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়েও বিষয়টি তাঁর মাথায় ছিল। তাই নামগত সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেও তিনি শব্দ সংকলনের জন্য এমন একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন, বস্তুত যা 'ঐতিহাসিক প্রণালীক্রমে সজ্জিত' অভিধানের জন্য অধিক মানানসই।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মারা গেছেন ৪১ বছর আগে। ৪১ বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতি তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 'ঐতিহাসিক প্রণালীক্রমে সজ্জিত' যে অভিধান তিনি চেয়েছিলেন, তা প্রণয়নের কোনো উদ্যোগ কখনো গ্রহণ করা হয়নি, না বাংলাদেশে না পশ্চিমবঙ্গে। অথচ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কাঙ্ক্ষিত সেই অভিধান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তাঁর প্রতি পরবর্তী প্রজন্মের শ্রদ্ধা সর্বোচ্চ উপায়ে নিবেদিত হতে পারত!

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. মুহম্মদ এনামুল হক, "মহামনীষী ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্," *শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ,* মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পা. (ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭), পৃ. ৪। অনেকে তাঁকে 'জীবন্ত বিশ্বকোষ' নামে অভিহিত করেন। যেমন, আজহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্* (কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৬৮), পৃ. ৬৪; গোলাম সাকলায়েন, *অন্তরঙ্গ আলোকে ডক্টর শহীদুল্লাহ্* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং, ১৯৭০), পৃ. ১০৯। বলা বাহুল্য, অনেকের কাছে অভিধান এবং কোষগ্রন্থ সমার্থক।

২. রাধাকান্ত দেব, সম্পা., *শব্দকল্পদ্রুম,* ৮ খণ্ড (কলকাতা : গ্রন্থকার, ১৮২২, ১৮২৭, ১৮৩২, ১৮৩৮, ১৮৪৪, ১৮৪৮, ১৮৫২ এবং ১৮৫৮)।

৩. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিদ্যাকল্পদ্রুম,* ১৩ খণ্ড (কলকাতা : গ্রন্থকার, ১৮৪৬-১৮৫১)।

৪. ২০০০ সালে প্রকাশিত এর পরিমার্জিত সংস্করণের ভূমিকায় বিষয়টি প্রথমবারের মতো উল্লিখিত হয়। দ্রষ্টব্য, "পরিমার্জিত সংস্করণের ভূমিকা ও ব্যবহারবিধি," *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,* পরিমার্জিত সং (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. সতেরো-কুড়ি।

৫. মনসুর মুসা, *মুহম্মদ শহীদুল্লাহ* (পুনর্মুদ্রণ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০২)।

৬. মুহম্মদ এনামুল হক, "মহামনীষী ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্," পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

৭. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, "বাঙ্গালা অভিধানে আমোদ," *শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী,* ১ম খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ৪১-৪৪

৮. উইলিয়াম কেরীর সহযোগী ক্লার্ক মার্শম্যানের একটি বিখ্যাত উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, তিনি লিখেছিলেন—আমার যদি কোনো শত্রু থাকতো আর তাকে শাস্তি দিতে চাইতাম, তাহলে পনেরো বছর ধরে তাকে অভিধানের কাজ করাতাম। আলোচিত, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, "ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও আঞ্চলিক ভাষার অভিধান," *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ,* শামসুজ্জামান খান প্রমুখ সম্পা. (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১৪১

৯. সৈয়দ আলী আহসান, "প্রথম সংস্করণের প্রসঙ্গ কথা," *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান,* ১ম খণ্ড (২য় মুদ্রণ; ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩ [প্র.প্র. ১৯৬৫]), পৃ. গ।

১০. আনিসুজ্জামান, "ভূমিকা," *শহীদুল্লাহ্-রচনাবলী,* ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. আট।

১১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, "ভূমিকা," *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান,* ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ধ।

১২. *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান,* ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. খ।

১৩. *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* প্রকাশের অব্যবহিত পরে প্রশ্নটি তুলেছিলেন সুবীর রায় চৌধুরী। সুবীর রায় চৌধুরী, "পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান," *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯

১৪. সংশ্লিষ্ট নথি থেকে উদ্ধৃত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,* পূর্বোক্ত, পৃ. সতেরো।

১৫. *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান,* ১ম খণ্ড, পৃ. গ।

১৬. তদেব, পৃ. ঘ।

১৭. অভিধান সম্পাদনা প্রসঙ্গে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর ভূমিকায় কোনো মন্তব্য করেন নি। বিষয়টি জাহাঙ্গীর তারেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জাহাঙ্গীর তারেক, "ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অভিধান-চিন্তা ও তার উত্তরাধিকার," *একুশের প্রবন্ধ '৯৫* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৭৮

১৮. *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, ১ম খণ্ড, "আইয়ে" ভুক্তি।

১৯. তদেব, পৃ. ধ। এর ধারাবাহিকতায় এর পরের দুটি বাক্য তথা ভূমিকার একেবারে শেষ বাক্য দুটিকে খানিকটা খাপছাড়া মনে হয়। আলাদা অনুচ্ছেদ হিসেবে হয়তো কিছুটা মানায়। বাক্যদুটি যথা : "আশা করি আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানী বাংলার আদর্শ অভিধানের প্রথম খণ্ড 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' সমস্ত বাংলা ভাষামোদীর নিকট সমাদরে গৃহীত হইবে। আমরা এই সুযোগে মাননীয় পাকিস্তান সরকার, আমাদের সংগ্রাহক এবং সহকারিবৃন্দের নিকট আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।"

২০. গোলাম সাকলায়েন, *অন্তরঙ্গ আলোকে ডক্টর শহীদুল্লাহ্*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১, ৩৫

২১. সৈয়দ আলী আহসান অবশ্য তাঁর প্রসঙ্গকথায় এই শব্দসংখ্যা প্রায় ৭৫ হাজার বলে জানান। *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ঘ। কিন্তু প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ৪৫টি শব্দ স্থান পেয়েছে দেখে এই সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের কম বলে অনুমান করা যেতে পারে।

২২. সৈয়দ আলী আহসান, "প্রসঙ্গকথা," *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. গ।

২৩. "প্রসঙ্গকথা," *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ঙ।

২৪. *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পৃ. পূর্বোক্ত, সতেরো।

২৫. *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পৃ. পূর্বোক্ত, উনিশ।

২৬. খানিকটা আশার কথা এই যে, ২০০০ সালে *ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের* পরিমার্জিত সংস্করণে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র নীতিমালার মূল চেতনাকে ধারণ করার চেষ্টা হয়েছে। বিশেষভাবে ভুক্তি বর্ণনার ভাষা চলিত করা হয়েছে, বানানের ক্ষেত্রে স্বরের হ্রস্ব নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, এমনকি আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দের উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে আরবি বর্ণের পাশাপাশি বাংলা প্রতিবর্ণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২৭. *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ. তেরো।

২৮. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০১ সালে মোহাম্মদ আবদুল হাই *ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের* (২০০০) ভূমিকায় উদ্ধৃত নীতিমালাটিকে 'প্রথম আলো' পত্রিকার শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকীতে ছেপে দাবি করেছিলেন যে, এটি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র অপ্রকাশিত রচনা। দ্রষ্টব্য, *প্রথম আলো*, ২০ এপ্রিল ২০০১

২৯. উদ্ধৃত, জাহাঙ্গীর তারেক, "ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র অভিধান-চিন্তা ও তার উত্তরাধিকার," পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭

৩০. *The Oxford English Dictionary*, 12 Volumes (Reprint; London : Oxford Uiversity Press, 1971).

৩১. জর্মন ভাষায় এই ধরনের অভিধান প্রণয়নের কাজ শুরু হয় ১৮৩৮ সাল থেকে, কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৯৬০ সালে। ফরাসি ভাষায় এই ধরনের অভিধান প্রণয়নের কাজ শুরু হয় ১৮৪৪ সালে, শেষ হয় ১৮৭৩ সালে। ওলন্দাজ, সুইডিশ এবং রুশ ভাষায়ও এ ধরনের অভিধান রয়েছে। সাম্প্রতিক কালের সর্ববৃহৎ অভিধানটি ফরাসি ভাষার, যার নাম Trésor de la Langue Française (১৯৯১)। দ্রষ্টব্য, জাহাঙ্গীর তারেক, "ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র অভিধান-চিন্তা ও তার উত্তরাধিকার," পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭।